সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬ ৩

শিশু শ্রেণীর পাঠ্যবই : সেকাল-একাল

শরীফুল্লাহ মুক্তি

মাঝে মাঝে সকালের লোকাল ট্রেনে আমাকে ঈশ্বরগঞ্জে কর্মস্থলে যেতে হয়। ট্রেনে প্রায়ই হকারদের কাছে বাহারি নামের ও রঙের রকমারি আদর্শলিপি দেখতে পাই। মাঝে মাঝে বেশ আগ্রহ নিয়ে বইগুলো দেখি। বিভিন্ন নামের আদর্শলিপি; যেমন- একের ভেতর পাঁচ, একের ভেতর দশ, একের ভেতর আট, একের ভেতর উনিশ, একের ভেতর একুশ, একের ভেতর অনেক, খালেদার আদর্শলিপি, রাজুর আদর্শলিপি, মিনার আদর্শলিপি, মিনা ও রাজুর আদর্শলিপি, ডোরেমনের আদর্শলিপি, ছন্দে ছবিতে বর্ণমালা ও বানান শিক্ষা, দশ রকমের আনন্দ, All in One, ABC Read Write and Play, খালেদার আদর্শলিপি: সীতানাথ বসাকের অনুকরণে, মিনার আদর্শলিপি: সীতানাথ বসাকের অনুকরণে ইত্যাদি। বেশ কয়েক বছর আগে নানার বাড়িতে পুরাতন কাগজপত্রের সঙ্গে সীতানাথ বসাকের একটি আদর্শলিপি পেয়েছিলাম। বইটি রেখেও দিয়েছিলাম সযত্নে। একদিন বইটি বের করে বেশ মনোযোগ সহকারে আবারও দেখলাম। তাই এ বিষয়ে কিছু কথা লেখার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

যুগ যুগ ধরে আদর্শলিপি সাধারণত অবোধ শিশুদের পড়ানো হয়। শতাধিক বছরব্যাপী শিশুর প্রথম পাঠ হিসেবে একচ্ছত্র প্রাধান্য বজায় রেখেছে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ'। এরপর রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' বাঙালির বাড়িতে শিশুদের প্রথম পাঠের বই হিসেবে বহুকাল প্রচলিত ছিল। শিশুদের বর্ণ শিক্ষায় পরবর্তীকালে প্রবেশ করে সীতানাথ বসাকের 'আদর্শলিপি'। নীতিবাক্য নির্ভর এই আদর্শলিপি বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। কালের অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে এক সময়ের জনপ্রিয় এই সব বই।

সীতানাথ বসাক রচিত আদর্শলিপিতে মেধা বিকাশ, আত্মশক্তির যোগান, মানসিক গুণাবলি, নৈতিকতা ও মানবিকতা অর্জনের বিষয়গুলো ছিল, যা কোমলমতি শিশুদের পরবর্তী জীবনে পাথেয় হিসেবে কাজ করতো। কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া সেই 'আদর্শলিপি' বইয়ের মতো 'আদর্শ' বইয়ের বড়ই অভাব আজকাল। বর্তমানের বইগুলোতে রয়েছে উদ্ভট তথ্য, ছড়া, গল্প। আবার কোনটিতে বেড়েছে ধর্মীয় ভাবাদর্শ। এসব বই থেকে পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে শৈল্পিক অঙ্কন শিল্প বা আর্ট। অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদরা মনে করেন বর্তমানে বাজারে পাওয়া নামসর্বস্ব আদর্শলিপিগুলোতে রঙে, অলঙ্করণে, বাক্য গঠনে শিশু-মনস্তত্ত্ব দারুণভাবে উপেক্ষিত।

সীতানাথ বসাকের আদর্শলিপি বইটি এখনো আমাদের কাছে আদর্শ। আদর্শের শিক্ষা ছড়ানো ১২ পৃষ্ঠার পাতলা সেই বইটি সাধারণ প্রচ্ছদে নিউজপ্রিন্ট কাগজে মুদ্রিত হতো। বইটি রঙিন ছবি সংবলিত নয়। তারপরও শিশুদের আকর্ষণ করতো অমোঘ নিয়মে। শিশুরা গলা হাঁকিয়ে, সুর করে, রগ টানটান করে মুখস্থ করতো এক একটি বাক্য। অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা, দরিদ্রকে অন্নদানের মতো নীতিবাক্যগুলো শিশুদের কোমল মনে গেঁথে দিত সেই আদর্শলিপি। নিউজপ্রিন্টের সেই মহামূল্যবান বইটি এখন খুঁজে পাওয়া ভার।

আদর্শলিপি ছিল শিশুদের সরল বর্ণ পরিচয়ের জন্য অপরিহার্য। শুধু বর্ণ পরিচয় নয়, আদর্শ চরিত্র গঠনেও ছিল সহায়ক। বইটির শুরু স্বরবর্ণ পরিচিতির মাধ্যমে। বর্তমানে আমাদের স্বরবর্ণের সংখ্যা ১১টি। কিন্তু আদর্শলিপির স্বরবর্ণের সংখ্যা ১৫টি। তবে '৯' কে সংখ্যা হিসেবে এখন সবাই জানে। আদর্শলিপিতে কিন্তু '৯' একটি স্বরবর্ণ। যার উচ্চারণ হতো 'লী' এর মতোন। এছাড়াও '৯' এর মাথায় আরেকটি '৯' দিয়েও হতো আরেকটি বর্ণ। 'অং' এবং 'অঃ' বিবেচিত হতো স্বরবর্ণ হিসেবে। আর যতি চিহ্নসহ ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৪১টি। আদি আদর্শলিপিতে স্বরবর্ণের সংখ্যা ছিল ১২টি। ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচিতিতে ছিল ৪০টি বর্ণ। এখনকার বাজারে পাওয়া আদর্শলিপির কোনোটিতে স্বরবর্ণ আছে ১৪টি, কোনটিতে ১৫টি, আবার কোনটিতে ১৬টি। তৃতীয় পাঠে ছিল বানান ও স্বরবর্ণের যোজনা। ৩ থেকে ৭ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর সঙ্গে স্বরবর্ণের যোজনা এবং 'য'ফলা, 'র'ফলা, 'ল'ফলা, 'ব'ফলা, 'ন'ফলা, 'রেফ'ফলা, 'ম'ফলার যোজনার পাঠ। এসব শেখা হলেই ৮ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে বাক্য গঠন। এই বাক্যগুলো ছিল নীতিবাক্য গঠন; যেগুলো শিশুদের নৈতিকতা শিক্ষা দিতো। সেগুলো শিক্ষার্থীদের মুখস্থও করানো হতো। আদর্শলিপিতে অ-তে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর, আ-তে আলস্য দোষের আকর, ই-তে ইক্ষুরস অতি মিষ্ট, ঈ-তে ঈশ্বরকে বন্দনা কর, উ-তে উগ্রভাব ভালো নয়, ঊ-তে ঊর্ধ্বমুখে পথচলিও না, ঋ-তে ঋষিবাক্য শিরোধার্য, এ-তে একতা সুখের মূল, ঐ-তে ঐশ্বর্য রক্ষা করা কঠিন, ও-তে ওষধি ফল পাকিলে মরে, ঔ-তে ঔদার্য মহৎ গুণ; এই ধরনের আদর্শ ও নীতিবাক্য শিশুদের শেখানো হতো। পরবর্তী সময়ে নতুন ছবিযুক্ত বইয়ে 'অজগর সাপ', 'আম' এসে বাক্য গঠনের শিক্ষা পাল্টে দেয়। নতুন বইয়ের মাধ্যমে শেখানো হয়, 'অ'-তে অজগরটি আসছে তেড়ে, 'আ'-তে আমটি আমি খাব পেড়ে ইত্যাদি।

বাক্যগঠন শেখা শেষে সময় নিয়ে শ্রুতি বাক্যের পাঠ শেখানো হতো। 'খেলায় মজিয়া শিশু কাটাইও না বেলা, সময়ের প্রতি কভু করিও না হেলা।' এরপরই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের চিরসবুজ কবিতা 'কে বড়?' 'আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,/ লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।/বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,/সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।...'। এরপর বয়েছে 'পিতা-মাতা'র ভক্তির জন্য পাঠদান। যেখানে বলা হয়েছে, 'পিতা-মাতা আমাদের পরম গুরু, তাহারা কত যত্নে ও কত কষ্টে আমাদিগকে লালন-পালন করিয়াছেন। আমাদের সুখের...।'- এই বাক্যগঠন ও শ্রুতিবাক্য পাঠে সাধুভাষার প্রচলন ছিল। তবে এখন সাধুভাষা উঠেই গেছে বলা যায়। আদর্শলিপি'র সুবাদে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুর প্রার্থনা কবিতাটি হয়ে উঠতো শিশুদের শেখা প্রথম কবিতার চরণ। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,/সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।/আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,/আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।...'। ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় আরো রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রুতি শ্লোক 'স্রষ্টার বন্দনা'। 'করিলেন যিনি জগৎ সৃজন...।' শুধু বাংলা বর্ণমালা আর বাংলা বাক্য গঠনের পাঠের মধ্য দিয়েই শেষ হয়নি আদর্শলিপি। রয়েছে শতকিয়া- যেখানে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো মুখস্থ করানো হতো। একই সাথে রয়েছে ইংরেজি ক্যাপিটেল লেটারের পাঠ- যাকে বাংলায় বলা হতো 'ছাপার বড় হাতের অক্ষর'। ২৬টি ইংরেজি বর্ণমালার নিচেই বাংলায় তার উচ্চারণও উল্লেখ করা ছিল। ফলে 'আ' এর উচ্চারণ 'এ' শেখানো হতো, যা এখন 'আ'তে রূপান্তরিত হয়েছে। আদর্শলিপির শেষ পৃষ্ঠায় আছে 'ইংরেজি স্মল লেটার' বা 'ছোট হাতের অক্ষর'। এরপর বাংলা সাত বার, ইংরেজি সাত বার এবং বাংলা বারো মাসের নাম পাঠের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আদর্শলিপি। বর্তমানে সেই আদর্শলিপি উঠে গেছে। হয়তো এর সাথে কিছু আদর্শও বিলীন হয়ে গেছে।

বইটি ছিল শিশুদের সরল বর্ণ পরিচয়ের জন্য সকলের কাছে আদৃত ও অপরিহার্য। শুধু বর্ণ পরিচয় নয়, আদর্শ চরিত্র গঠনেও ছিল সহায়ক। বইটিতে অনেক নীতি-আদর্শিক বাক্য শেখানো হতো। বর্তমানে শিশুদের বর্ণ পরিচয়ে পড়ানো হচ্ছে ডোরেমন, মটু-পাতলু মিনার আদর্শলিপি। আবার আছে কারো নামের আদর্শলিপি। শিশুপাঠ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে খালেদার আদর্শলিপি, হাসিনার একের ভেতর দশ, তুলি, ঋতুর আদর্শলিপি ইত্যাদি বিচিত্র সব বই। সীতানাথ বসাকের আদর্শলিপির প্রচ্ছদ ছিল একটি শাপলা ফুল- যা এখনো অনেকের মনে গাঁথা। এখনকার আদর্শলিপিগুলোয় অঙ্কন শিল্প বা আর্ট পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। চোখ ধাঁধানো করতে গিয়ে অযথা রঙের বাড়তি ব্যবহার করা হয়েছে। অলঙ্করণ বলে কিছু নেই। কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা না করে, গবেষণা না করে, শিশু মনস্তত্ত্ব বিবেচনা না করে, দেশিয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ না রেখেই বিদেশি কার্টুন চরিত্র যেমন- ডোরেমন, মটু-পাতলু, মিকি মাউস ইত্যাদির ছবি জুড়ে দেওয়া হয়েছে বইয়ের প্রচ্ছদসহ সারা বইয়ে।

বর্তমানে বাজারে পাওয়া আদর্শলিপিগুলোতে শিশুউপযোগী নয় এমন অনেক বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে। শিশুপাঠ্যে কিছু নিগূঢ় বা বিমূর্ত বিষয় স্থান পেয়েছে যেগুলো শিশুরা বুঝতে অক্ষম। যেমন, এ-তে একতা; সঙ্গে কিছু হাত একসঙ্গে জোড়া করা একটা ছবি। ঋ-তে ঋতু; পাশে ছয়টা ঋতুর ছবি। 'ঃ' তে দুঃখ; ছিন্নবস্ত্র পরা, লাঠি হাতে ভিক্ষুকের ছবি। একতা, ঋতু বা দুঃখ শিশুদের বোঝানো অনেক কঠিন ও দুঃসাধ্য। নিঃস্ব, দুঃসময়, দৈবাৎ, চিৎপাত, কূপণ এসব বিমূর্ত শব্দের ধারণা কীভাবে একটা শিশুকে দেয়া সম্ভব বা আদৌ ওই বয়সে এগুলোর ধারণা দেয়া খুব জরুরি কিনা এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

শিক্ষকের বুলি আর বইয়ে লেখা প্রতিটি বাক্য শিশুদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান এবং এগুলো তারা মেনে চলতেও সচেষ্ট থাকে। আগে আমরা পড়তাম, ক- কটুবাক্য বলা অনুচিত। খ- খলকে বিশ্বাস করো না। গ- গর্ব করা ভালো নয়। জ- জনক-জননী অতি পূজ্য। 'লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে'- ছোটবেলা থেকেই আদর্শলিপিতে প্রকাশিত এ ধরনের জীবনদর্শন নিয়ে বেড়ে উঠেছি আমরা অনেকেই। এখন শিশুদের পড়ানো হচ্ছে- অ-তে অজগরটি আসছে তেড়ে...। বর্তমানে একটা শিশু শিক্ষাজীবন শুরু করছে তার দিকে একটা অজগর তেড়ে আসছে এটা কল্পনা করে! শিশুদের পড়ানো হচ্ছে- 'তাই তাই তাই/মামার বাড়ি যাই/মামা দিল দুধভাত/পেট ভরে খাই/মামি এলো লাঠি নিয়ে পালাই পালাই।' এই ছড়ার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের আসলে কী শেখানো হচ্ছে? বরং তাদের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে মামি মানে নেতিবাচক ব্যক্তি। তাহলে শিশুরা কী শিখে বড় হচ্ছে? তাছাড়া এখন শেখানো বেশিরভাগ ছড়াই হচ্ছে অর্থহীন - যা থেকে শিশুদের আসলে কি কিছু শেখার আছে? রেলগাড়ি ঝমাঝম/পা পিছলে আলুর দম/ইসটিশনের মিষ্টি কুল/সখের বাগান গোলাপ ফুল, আগডুম-বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে/ঢাক-ঢোল ঝাঁঝর বাজে /বাজতে বাজতে চলল ঢুলি/ঢুলি গেল কমলাফুলি/কমলাফুলির টিয়েটা/সুয্যি মামার বিয়েটা, হাট্টিমাটিম টিম/তারা মাঠে পাড়ে ডিম/তাদের খাড়া দুটো শিং/তারা হাট্টিমাটিম টিম- বর্তমানে এসব ছড়া শেখানো হচ্ছে। এ ছড়াগুলোতে আসলে কোনো মেসেজ আছে কি? এসব বই কীভাবে শিশুপাঠ্য হয়? আসলে এ বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবকদের চেয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের ভূমিকাই অনেক বেশি। তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে এগুলো শিশুদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করছে।

আজকের দিনের বর্ণক্রমিক ভাষাশিক্ষার পরিবর্তে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি চালু হয়েছে। শিশুর ভাষা শেখার যে স্বাভাবিক পদ্ধতি তার ওপর ভিত্তি করেই দেশে-বিদেশে এ পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মূলধারার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (সরকারি ও নব্য-সরকারি) প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী চালু রয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুদের জন্য 'আমার বই' এবং শিক্ষকদের জন্য 'শিক্ষক সহায়িকা' প্রণয়ন করেছে। তাছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন এবং উপকরণ তৈরি করে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। সরকারি স্কুলগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে এগুলো ব্যবহার করা হলেও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো তা ব্যবহার করছে না। তারা তাদের ইচ্ছেমতো পাঠ্যসূচি তৈরি করে শ্রেণী-কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় আদর্শলিপি কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? বিভিন্ন শ্রেণীতে (প্লে, নার্সারি, কেজি) বিভিন্ন নামের বিভিন্ন প্রকাশনার একাধিক আদর্শলিপি (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ধর্ম প্রতি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা) পাঠ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আদর্শলিপি প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার এখনো মনে আছে। আমরা ছেলেবেলায় যে বইগুলো পড়তাম, এখন বেশ একটা দেখা যায় না। আমরা শিশুকালে যেসব বই পড়েছিলাম, আর এখনকার বইগুলো বেশ অন্যরকম। নীতিবাক্য পড়ানোর বই হারিয়ে গেছে। বর্তমানে আমাদের লেখাপড়া শেখানো হয় পরীক্ষা পাসের জন্য; আদর্শ নাগরিক তৈরি করার জন্য নয়। ফলে এখন সমাজে নানা ব্যাধি ছড়াচ্ছে।'

শিশুকালে চরিত্র গঠনে উন্নতি না করতে পারলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সর্বত্রই। আজকের শিশুই আগামী দিনে দেশকে নেতৃত্ব দেবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায়। কিন্তু যদি কোন শিশু শিক্ষা জীবনের শুরুতে সঠিক দিক-নির্দেশনা না পায়, তাহলে এর জন্য খেসারত দিতে হয় পুরো জাতিকেই। তাই আগামীর সুস্থ, সুন্দর ও সক্ষম জাতি গঠনের জন্য এ বিষয়ের প্রতি আমাদের সকলেরই সচেতন হওয়া জরুরি। সীতানাথের আদর্শলিপি বা তার আদলে তৈরি বই-ই শিশুদের পড়তে দেয়া উচিত।

শিশু বয়সে মানুষ যা শেখে তাই পরবর্তী জীবনে তার পথ চলার পাথেয় হিসেবে কাজ করে। শিশুকালের শিক্ষাই হয় তার সারা জীবনের ভিত্তি। আসলে শিশুদের বই নির্বাচনের মাপকাঠি কী হওয়া উচিত? আমাদের ফুলের মতো শিশুরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে তাদের শিক্ষকদের কথা এবং বইয়ের লেখা। শিশুদের কাছে শিক্ষকের কথা এবং বইয়ের বাণী বেদবাক্যের মতো। এই সময়ে শিক্ষকের কথাগুলো শিশুরা সারা জীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করে। শিশু বয়সে শিক্ষক হলেন তাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। শিক্ষক যদি অজান্তে কোনো ভুল করেন বা ছাপানো বইয়ে যদি কোনো ভুল থাকে এবং অন্য কেউ যদি তা শুধরেও দেয়- শিশুরা সেটা মানতে নারাজ। কাজেই শিশুবয়সের বইটি তেমনি হওয়া উচিত। বইটি অবশ্যই হতে হবে শিশুদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিশুর চেতনার ছোট জগৎটি যদি সুষম জ্ঞান-খাদ্যের উপাদানে সুসমৃদ্ধ হয়, তাহলে সেই শিশুর চিন্তা হবে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ, সেই শিশুর মানস জগৎ হবে পৃথিবীর বাস্তবতায় বিকাশমান। তাই আগামী দিনের মানবিক প্রজন্ম গড়ার স্বার্থে এখনই শিশুপাঠ্য বইয়ের ব্যাপারে আমাদের সবাইকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। ভেবে উদ্ভাবন করতে হবে মানবিক ও নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ শিশুপাঠ্য বই।

[লেখক: ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি), ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ]
ahmsharifullah@yahoo.com